OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 118 - 127*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 118 - 127*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# বনফুলের ‘শ্রীমধুসূদন’ : এক বিবর্তিত সময়ের প্রতিবিম্ব

**ড. টিটন রুদ্র পাল**
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সরকারি আদর্শ মহাবিদ্যালয়
Email ID: rudrapaul88@gmail.com
0009-0009-3785-0096

***Received Date*** *30. 03. 2026*
***Selection Date*** *07. 04. 2026*

***Keyword***
*Madhusudan’s life, Nineteenth-century, young people, discrepancy, society, portrait.*

***Abstract***

*Balaichand Mukhopadhyay, better known by his pen name ‘Banophul’, is widely recognized in Bengali literature as a short story writer. However, the smooth and effective presentation of his play ‘Srimadhusudan’, published in 1940, proves that he was also a successful playwright. In this play, while narrating various events from the life of Madhusudan, the playwright also brings out many aspects of the contemporary society. The drama attempts to depict the mid-nineteenth century or its surrounding period.*

*In fact, the time of Madhusudan’s emergence in the nineteenth century was one of extreme turmoil. The clash between traditional and modern ideas had greatly disrupted social life. As a result, in the second half of the nineteenth century, during the Bengal Renaissance, the instability present in contemporary society also had a significant impact on Madhusudan’s personal life. In the play under discussion, the playwright portrays various realistic aspects of the society centered around Calcutta of that time. From the first half of the nineteenth century, issues such as the moral decline of the youth in India, the caste system, and the degradation of women had become increasingly prominent, and these are described throughout the play.*

*Essentially, at the same time, it is worth mentioning that during that period, some young men educated in English became quite arrogant. They considered everything other than English literature and culture to be insignificant. The youth of Bengal began to value rational thinking, logic, and scientific awareness more than ancient beliefs, traditional customs, blind faith, and superstitions.*

*However, alongside these positive aspects, the youth were not free from negative influences. A section of them, in the name of progressiveness, began to mock and ridicule everything related to Hinduism. They openly engaged in smoking, drinking alcohol, and consuming forbidden meat. During this time, many young people tried to modernize their thoughts and ideas under the influence of the young teacher of Hindu College, Henry Louis Vivian Derozio. Under his leadership, the Young Bengal group was formed. Deeply influenced by Western ideals, this group of young people strongly protested against*

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 118 - 127*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

*practices such as caste discrimination, untouchability, oppression of women, gender inequality, and forced labor.*

*All these harsh realities of nineteenth-century society have been realistically portrayed in the play. Through the depiction of Madhusudan's personal life, the play vividly presents the social environment of the nineteenth century, making it a valuable document of that era. In my discussion, based on Banophul's play 'Srimadhusudan', I will attempt to describe these realistic aspects of contemporary social life from a descriptive perspective.*

## Discussion

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যাকাশে উল্লেখযোগ্য নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। 'বনফুল' ছদ্মনামেই তিনি বেশি পরিচিত। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার এবং প্রাবন্ধিক ছিলেন। তবে তিনি যে একজন সার্থক নাট্যকারও ছিলেন তার প্রমাণ পাই ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'শ্রীমধুসূদন' নাটকের সাবলীল উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে। নাটকের সূচনা অংশ থেকে জানা যায় যে, বনফুলের সাহিত্যরসিক বন্ধু অমূল্যকৃষ্ণ রায়ের উৎসাহে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন অবলম্বনে নাটক রচনার স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়িত করেছেন। বলাবাহুল্য 'শ্রীমধুসূদন' নাটকই বাংলা সাহিত্যের প্রথমদিকের সার্থক ব্যক্তি চরিত্রকেন্দ্রিক নাটক। যদিও এর আগে বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক চরিত্রকেন্দ্রিক নাটকও কিছু কিছু রচিত হয়েছে। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো সাহিত্যিককে নাটকে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করা নিঃসন্দেহে বনফুলের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন, -

> "বনফুল পর্যাপ্ত নাটক রচনা করলেও নাট্যকার হিসেবে তিনি অমরত্ব পেয়ে গেছেন শ্রীমধুসূদন এবং বিদ্যাসাগর – এর জন্য। প্রায় সমসাময়িক অথচ অনন্য মহাপুরুষদের জীবনকথা নিয়ে 'রঙ্গমঞ্চের নৈবেদ্য সাজাবার পথ' দেখিয়েছেন তিনি। শ্রীমদধুসূদন-এর সাফল্য আজও নাটকের ইতিহাসে চর্চার বিষয়।"[১]

এই নাটকে কোনো অঙ্ক বিভাগ নেই। নাটকের সমগ্র কাহিনি একুশটি দৃশ্যে বর্ণিত হয়েছে। নাটকের মূল কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন মধুসূদন দত্ত। তাঁকে কেন্দ্র করেই কাহিনির অন্যান্য চরিত্ররা আবর্তিত হয়েছে। মধুসূদনের জীবনের নানা উত্থান-পতন নাট্যকার বাস্তবসম্মতভাবে এই নাটকে তুলে ধরেছেন। নাটকে মধুসূদনের জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনার অনুষঙ্গে উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজের নানা দৃশ্য। এই নাটকে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী বা এর সমসাময়িককালকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি মূলত মধুসূদনের আঠারো থেকে ঊনপঞ্চাশ বছরের জীবনপরিধি অবলম্বনে রচিত হয়েছে। মধুসূদনের বর্ণময় জীবন, বিশেষত জীবনের সূচনাপর্বে বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অবজ্ঞাসূচক আচরণের পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যের মহাকবি হওয়ার স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া এবং পরবর্তীতে অনুতপ্ত চিত্তে বাংলা সাহিত্য সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করে এক নজির সৃষ্টিকরণ ইত্যাদি নানা নাটকীয় কাহিনির উপকরণ নাট্যকারকে এই নাটক রচনায় প্রেরণা জোগায়।

বস্তুতপক্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী থেকে জানাযায় যে, তিনি গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে ও তৎকালীন সময়ের আর দশজন মানুষ থেকে বরাবরই পৃথক ছিলেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে বরদাস্ত করতে না পারার জন্যই অর্থাভাবের মধ্যেও তিনি রাজার মতো বাঁচতে চেয়েছেন; আবার আত্মমর্যাদার দরুণ কলকাতার ইংরেজ বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজে সহজভাবে মেশাও তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। তাই তিনি ছিলেন বরাবরই একা। তাঁর জীবনে বিক্ষেপ প্রবল, ক্ষয় প্রবল, নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়ার আত্মঘাতী অভীপ্সাও প্রবল। তাই জীবনের প্রথমদিকে তিনি সুখভোগ করতে পারলেও জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন নিদারুণ অর্থসংকট ও কষ্টের মধ্যদিয়ে। মধুসূদনের জীবনের এই নাটকীয় পরিণতির কথা তুলে ধরতে গিয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 118 - 127*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> "মধুসূদনের নাটকীয় জীবনকাহিনী শিক্ষিত লোকেরই জানা আছে। যে জীবনে গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো বিষণ্ণতা নেমে এসেছিল, যিনি বিত্তের ওপর আসন করে বসলেও শেষ জীবনে হাসপাতালে অনাত্মীয় পরিবেশে মারা গিয়েছেন, অমিত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও নৈরাশ্যের বুকভরা নিশ্বাস নিয়েই যিনি জীবনরঙ্গমঞ্চ থেকে রোগজীর্ণ শরীরে বিদায় নিয়ে গেলেন, তাঁর কথা কে না জানে?"[২]

বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে মধুসূদনের জীবনের এই ট্র্যাজিক পরিণতির কথাই বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে উনিশ শতকে মধুসূদনের আবির্ভাবের কালটি ছিল চরম অস্থিরতার কাল। তখন প্রাচীন ও নবীনের চিন্তা-চেতনার সংঘর্ষে সামাজিক জীবন অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মধুসূদনের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে জানাতে গিয়ে ড. দেবেশ কুমার আচার্য্য বলেছেন, -

> "সংঘাতমুখর নবজাগরণের যুগে ঊর্ধ্বলোক থেকে এই পৃথিবীতে নেমে এসেছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রূপ মধুসূদন।"[৩]

ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় নবজাগরণের পটভূমিতে সমকালীন সমাজ জীবনে যে অস্থিরতা চলছিল তার প্রভাব মধুসূদনের ব্যক্তি জীবনেও পড়েছিল। কারণ মানুষ মাত্রেই সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজ বহির্ভূত মানুষের আলাদা কোনো সত্তা নেই। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই চারপাশের প্রতিবেশের প্রভাব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় যে পড়বে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর এর প্রভাব থেকে মধুসূদন দত্তের জীবনও রেহাই পায়নি। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন, -

> "সাহিত্য প্রতিভার বিচারে মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩) নিশ্চিতভাবে নিজের সৃষ্টিশীলতার ঘনিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখেছেন, কিন্তু জীবনচর্চায় যুগ-পরিবেশের প্রভাব তিনিও এড়াতে পারেন নি।"[৪]

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য দেশ, কাল ও সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ফলে সমকালীন বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক কার্যকলাপ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, স্বাধীনতালাভ ও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানা সমস্যা ও ঘটনা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো অনেক নাটকেরই মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। আমাদের চারপাশের প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা সামাজিক ঘটনাসমূহ বহু নাটক রচনার মূল প্রেরণা হিসাবে নাট্যকারদের মনের ভিতরে কাজ করে যায়। আর এই চিরপরিচিত সমাজের নানা ঘটনা তথা সমস্যার কথা ফুটে উঠেছে বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক সমাজ প্রতিবেশের নানা বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে ভারতবর্ষের যুবসমাজের অধঃপতন, জাতিভেদ প্রথা এবং নারীর অবমাননা ইত্যাদি নানা সামাজিক পরিস্থিতি যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তার কথাই আলোচ্য নাটকের পরতে পরতে বর্ণিত হয়েছে।

এই নাটকে উনিশ শতকের অভিজাত, বনেদী, উচ্চবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি পরিবার এবং খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত উচ্চবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি পরিবারের সাংসারিক সুখ-দুঃখ ও সমস্যার কথা উঠে এসেছে। এই নাটকের প্রধান চরিত্র মধুসূদন দত্ত গোঁড়া হিন্দু পরিবারের সন্তান হয়েও খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর বেশভূষা, আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, চালচলন, কথাবার্তায় ইংরেজি সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত বেশি ছিল। পিতার সামনেও তিনি ধূমপান বা মদ্যপান করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। বলাবাহুল্য তৎকালীন সময়ে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কিছু যুবক খুব ঔদ্ধত্য হয়ে উঠেছিল। তখন তারা ইংরেজি সাহিত্য, সংস্কৃতি ছাড়া বাকি সবকিছুকেই তুচ্ছ বলে মনে করত। নাটকের শুরুতে আমরা দেখি মধুসূদন ভারতীয় আদর্শ ও পরম্পরাকে অবজ্ঞা করছেন। তাঁর মতে ভারতীয় আদর্শে অনুকরণীয় কিছুই নেই। তাঁর মা জাহ্নবী দেবী যখন বলেন শ্রীরামচন্দ্র ভারতীয়দের আদর্শ; তখন মধুসূদন শ্রীরামচন্দ্রকে 'অপদার্থ' বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। একথা শুনে জাহ্নবী দেবী মধুসূদনকে যে কথাটি বলেন তা থেকেই তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ঔদ্ধত্য যুবকদের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে এইভাবে, "ইংরেজি পড়ে এই বিদ্যে হচ্ছে বুঝি!"[৫]

আসলে এখানে মধুসূদনকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করা হলেও এর দ্বারা তৎকালীন যুব সমাজের মনোভাবের আসল রূপটি আমাদের সামনে পরিস্ফুটিত হয়েছে। বাংলায় তখন ইংরেজদের বাণিজ্য ও শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে একদল

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 118 - 127*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

বাঙালি ইংরেজদের সংস্পর্শে আসেন। অনেকে তখন ইংরেজদের বাণিজ্যিক আড়তে দেওয়ান, বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দির কাজ করতেন এবং তাঁদের বাণিজ্য দেখাশোনা করতেন। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে তাঁরা কাজ চালাবার মতো অল্প-বিস্তর ইংরেজি জ্ঞান লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁরা পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হন। একই সঙ্গে এই প্রভাব বাংলার যুব সমাজকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করে। তারা প্রাচীন ধ্যান ধারণা, চিরাচরিত প্রথা, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের পরিবর্তে বিচারশক্তি, যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচেতনাকে অধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করে। তবে এর ভালো দিকের পাশাপাশি কুপ্রভাবের হাত থেকেও যুবসমাজ রেহায় পায়নি। যুব সমাজের একাংশ প্রগতিশীলতার নামে হিন্দুধর্মের সব কিছুতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে শুরু করে। তারা প্রকাশ্যে ধূমপান, মদ্যপান, নিষিদ্ধ মাংসভক্ষণ শুরু করে। সমকালীন সময়ে হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও সাহেবের আদর্শে বহু যুবক নিজেদের চিন্তা চেতনাকে তথাকথিত আধুনিক করে তুলবার চেষ্টা করেছিল। ডিরোজিওর নেতৃত্বে তখন গঠিত হয় ইয়ংবেঙ্গল দল। এই দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন, -

> "এই ইয়ং বেঙ্গল দলের উদ্দেশ্য ছিল সার্বিক সমাজসংস্কার-পৌত্তলিকতা ও অন্ধ কুসংস্কারের উচ্ছেদ।"[৬]

পাশ্চাত্যের অন্ধমোহে আবিষ্ট এই তরুণ গোষ্ঠী প্রচলিত জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, নারী নির্যাতন, স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য, বেগার প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। উনিশ শতকের এই পটভূমিকার কথা তুলে ধরতে গিয়ে সমালোচক জানান,-

> "ফরাসী বিপ্লবের আন্দোলনের তোরঙ সকল ভারতক্ষেত্রেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ১৮২৮ সালে যাঁহারা শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন ও যে যে কবি ও গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী অধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মন ও উক্ত গ্রন্থাবলী ফরাসীবিপ্লবজনিত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গীয় যুবকগণ যখন ঐ সকল শিক্ষকের চরণে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন এবং ঐ সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তাহাঁদের মনে এক নব আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম ও প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাহাঁদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল।"[৭]

এই সমস্ত নানা প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী হয়েও অনেক ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও উগ্র মনোভাবের কারণে তাদের আচরণগুলি দৃষ্টিকটু মনে হত। এই জন্য আলোচ্য নাটকে দেখাযায় গৌরদাস বসাকের পিতা রাজকৃষ্ণ বসাক সমকালীন ছেলেদের আচরণে সন্ধিহান হয়ে বলেন, -

> "আজকাল তোমরা বাবা লেখাপড়া শিখছ বটে কিন্তু তোমাদের চালচলন কেমন যেন-"[৮]

আবার অন্যত্র রাজনারায়ণ দত্তকে এপ্রসঙ্গে তিনি বলছেন, -

> "আজকালকার এই কলেজের ছোকরারা বড় বেশী স্বাধীন হয়ে পড়েছে ভায়া। একগাদা টাকার শ্রাদ্ধ করে কি শিক্ষাই যে ছেলেরা আজকাল পাচ্ছেন তা আর কহতব্য নয়।"[৯]

নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত বহু বালকেরা তখন হিন্দুদের সনাতন ধর্মকে আর মেনে নিতে পারছিল না। সনাতন ধর্মের নানা আচার আচরণ তাদের কাছে কুসংস্কার বলে মনে হতে লাগলো। তাই মধুসূদনের বন্ধু বঙ্কু বলে উঠে, -

> "সনাতন পদ্ধতিকে কেন মেনে চলব আমরা?"[১০]

এসবের মধ্যে সেই সময়ে বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকদেরও রমরমা চলছিল। সনাতন হিন্দু ধর্মেরই নানা শাখা-প্রশাখা তখন নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে তৎপর হয়ে উঠেছিল। হিন্দু ধর্মের 'তত্ত্ববোধিনী সভা' আর 'ব্রাহ্মসমাজ' এর পাশাপাশি ছিল পাশ্চাত্য দেশ থেকে আহরিত খ্রিস্টান ধর্মের পাদরিদের নানা ক্রিয়াকলাপ। তখন খ্রিস্টান ধর্মের পাদরিরা এদেশের মানুষদের নানা লোভ দেখিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করে নিত। এ প্রসঙ্গে নাটকের অন্যতম চরিত্র ভূদেব বলেন, -

> "অনেকে ক্রিশ্চান হয় পেটের দায়ে, চাকরীর লোভে।"[১১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 118 - 127*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

নাটকের প্রধান চরিত্র মধুসূদনকেও লোভ দেখানো হয়েছিল যদি তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে নেন তবে তাঁকে বিলেত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। বলাবাহুল্য মধুসূদনের হিন্দু ধর্ম থেকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার নেপথ্যে এটি একটি বড় কারণ ছিল। তাছাড়া তখন হিন্দু ধর্মের মধ্যেও নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। ফলে বহু সাধারণ মানুষ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। আলোচ্য নাটকের অন্যতম চরিত্র তথা মধুসূদনের বন্ধু রাজনারায়ণ বসু মধুসূদনের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন -

> "খৃস্টান হওয়াটা অবশ্য প্রাণের ভেতর থেকে সমর্থন করি না, কিন্তু বর্তমান হিন্দু সমাজ বলতে যা বোঝায় তাতেও কোন ভদ্রলোক টিকতে পারে না।"[১২]

আবার সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে তখন এই সমাজ তাকে আর গ্রহণ করে নিত না। তাই মধুসূদন যখন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন তখন তাঁর মা তাঁকে ক্ষমা করে দিলেও বাবা ক্ষমা করে দেননি। তিনি উচ্চকণ্ঠে তিরস্কারস্বরূপ বলেন, -

> "ছেলে খৃস্টান হয়েছে— ধর্মত তাঁর মৃত্যু হয়েছে— আমরা অপুত্রক হয়েছি— তার জন্যে কাঁদতে পার— কিন্তু আর তাকে ফিরে পাবে না"[১৩]

আবার তৎকালীন সময়ে সমাজে সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে 'বাবু' বলে একশ্রেণির মানুষের অভ্যুদয় দেখা যায়। এই বাবু শ্রেণির মানুষের অবসর সময়ে বুলবুলি লড়াই ও বাচ খেলা দেখার অভ্যাসের কথা আলোচ্য নাটকে উঠে এসেছে। নাটকে মধুসূদন যখন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে ফোর্ট উইলিয়মে আশ্রয় নেন তখন তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। কিন্তু এর ভিতরে যে তারা ঢুকতে পারবে না এটা বুঝে বঙ্কুকে হরি বলে এই প্রচেষ্টা করার চেয়ে পেনেটির বাগানে বুলবুলির লড়াই দেখে সময় কাটানো ভালো। উক্ত বিষয়টি আলোচ্য নাটকে হরির মুখে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে, -

> "...তার চেয়ে চল বাবা বুলবুলির লড়াই হচ্ছে দেখি গে। পেনেটির বাগানে ভাল বাচ খেলাও আছে আজ।"[১৪]

এর থেকে বুঝা যায় এই শ্রেণির লোক তখন উপরিউক্ত খেলাগুলি দেখে অবসর বিনোদন করত। এই ধরনের মানুষের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন, -

> "এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে "বাবু" নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ...এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত।"[১৫]

আবার শুধুমাত্র তৎকালীন যুবসমাজই নয় তখনকার বয়স্ক ধনী গৃহস্থদের মধ্যেও চারিত্র্যিক অবনতি দেখা দিয়েছিল। বাঈজী বাড়ি যাওয়া কিংবা বাঈজীদের বাড়িতে ডেকে এনে তাঁদের নৃত্য উপভোগ করা ইত্যাদি তখন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কখনো কখনো এই বিষয়টিতে ঢুকে যেত অহংকার ও সুপ্ত প্রতিযোগিতা। এই ক্ষেত্রে কোন ধনী ব্যক্তি কত টাকা খরচ করল সেটার উপর চলত নানা আলোচনা ও সমালোচনা। আমাদের আলোচ্য নাটকের মধ্যেও এই দিকটি ফুটে উঠেছে। নাটকে দেখাযায় মধুসূদনের বাবা রাজনারায়ণ দত্ত একজন ধনী প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তিনি নিজের অবস্থান নিয়ে কখনো কখনো অহংকারও করেন। আবার বাড়িতে নানা উপলক্ষ্যে বাঈজীদের ডেকে এনে আসর জমিয়ে আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণ দিতে চান। এই নাটকের অষ্টম দৃশ্যে দেখা যায় তিনি বাড়ির বৈঠকখানায় বাঈনাচের আসর জমিয়েছেন। তৎকালীন এই শ্রেণির মানুষের প্রকৃতস্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 118 - 127*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> "ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্তকী সহরে আসিত, তাহারা বাঈজী এই সম্ভ্রান্ত নামে উক্ত হইত। নিজ ভবনে বাঈজীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন ধনী কোন প্রসিদ্ধ বাঈজীর জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ সহরের ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোষাবহ জ্ঞান করিত না।"[১৬]

তাছাড়া অতি প্রাচীনকাল থেকে জাতপাতের সমস্যা, বর্ণভেদের অভিশাপ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় যেভাবে দুষ্ট ক্ষতের মতো বিরাজ করছে সেদিকটিকেও এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণত উচ্চজাতি এবং উচ্চবর্ণের মানুষ নিজেদের স্বার্থে দীর্ঘকাল ধরে সমাজব্যবস্থায় ও সমাজ বিন্যাসের মধ্যে এই বিভেদ বৈষম্য নীতিকে জিইয়ে রেখেছে। কারণ এমন বিভেদ নীতি থাকলে উচ্চবর্ণের লোকের নানা সুযোগ সুবিধা পেতে সুবিধে হয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার এধরনের বিভেদ নীতি এবং তার বিষাক্ত ফলের নিদর্শন আলোচ্য নাটকেও লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় জাতপাতের ভেদাভেদের বিষয়টি চরম রূপ লাভ করেছিল। সেকালে হিন্দু ধর্মের মানুষ ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিল। নাটকে দেখা যায় রাজনারায়ণ দত্ত একজন কায়স্থ ঘরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ধনী, শিক্ষিত, গোঁড়া হিন্দু হিসাবে সমাজে তাঁর খুব প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যখন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব রাজকৃষ্ণ বসাকের বাড়িতে গেলেন তখন তাঁকে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করা হয়। রাজকৃষ্ণের বাড়িতে নানা জাতের লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হুঁকো বরাদ্ধ ছিল। ফলে কায়স্থ রাজনারায়ণ দত্তের জন্যে কায়স্থের ব্যবহৃত হুঁকোরই ব্যবস্থা করা হল। তাই রাজকৃষ্ণ বসাক বাড়ির ভৃত্যদের বলেন, -

> "ওরে কায়স্থের হুঁকোটা নিয়ে আয়--"[১৭]

নাটকের অন্যত্র দেখাযায় কমলমণি যখন চা আর জলখাবার প্রস্তুত করার জন্যে বাড়ির চাকরকে বলেন তখন কৃষ্ণমোহনের স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী বলেন, -

> "না বাছা—ও সব অনাচার আমি সইতে পারব না। মেলেচ্ছ চাকরের হাতে আমি খেতেও পারব না—কাউকে খেতে দিতেও পারব না। কি জাত তার ঠিক নেই।"[১৮]

বিয়ের ব্যাপারেও এই জাতপাতের ভেদাভেদ খুব গুরুত্বসহকারে মেনে চলা হত সমকালীন সময়ে। আলোচ্য নাটকে দেখা যায় দেবকী কুলীন বংশের মেয়ে। তাঁর পিতা মাতা তাঁকে কায়স্থ বংশের ছেলে মধুসূদনের সঙ্গে বিয়ে দিতে নারাজ। মধুসূদন এর কারণ জিজ্ঞেস করায় দেবকীর মা বিন্ধ্যবাসিনী বলেন, -

> "কিন্তু আসল কথা কি জান বাবা—আমরা নৈকষ্য কুলীনের বংশ— আমাদের বংশের মেয়েকে কায়স্থের হাতে দিতে কেমন যেন মন সরে না।"[১৯]

তাছাড়া নাটকে দেখা যায় গৌরদাস বসাক ছিলেন বৈষ্ণব বংশের ছেলে। তৎকালীন সময়ে বৈষ্ণবরা আমিষ তথা মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকত। কিন্তু মধুসূদন ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে মিশে প্রতিদিনই তিনি মদ্য মাংস খেতেন। আর এর জন্যে তাঁর মধ্যে অজানা এক অপরাধবোধ কাজ করতো। তাইতো তিনি বলেছেন, -

> "আমি বৈষ্ণবের ছেলে—আমার জাতটা মারলি দেখছি তোরা। রোজ রোজ মাংস খাচ্ছি, বাবা যদি টের পান ভীষণ কাণ্ড করবেন!"[২০]

এমনকি তখন সমাজে এটাও প্রচলিত ছিল যে যদি কেউ বিলেত যায় তাহলে তাকে সমাজের বাইরে স্থান দেওয়া হত। কারণ তখন এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে বিলেত গেলে খাওয়াদাওয়া নিয়ে অনাচার করা হয়। তাই সমদ্রপথ দিয়ে বিলেত গিয়ে আবার ফিরে এলেও সমাজ তাকে আগের মতো গ্রহণ করে নিতো না, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার এই কঠোর দিকটির কথা আলোচ্য নাটকে উঠে এসেছে মধুসূদনের মুখ দিয়ে এইভাবে, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 118 - 127*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> "...আমি বিলেত যাবই— তখন এ সমাজে আমার স্থান হবে কি করে? এ সমাজে ত বিলেত ফেরতদেরও স্থান নেই।"[২১]

আসলে তৎকালীন সময়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও জাতিভেদপ্রথা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, হিন্দু-খ্রিস্টান, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল। তাঁরা নিজেরা পরস্পর থেকে ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতেন। ফলে সমাজে তখন চরম বৈষম্য ও ব্যভিচার সৃষ্টি হয়েছিল। আসলে জাতপাতের ভেদাভেদের বিষয়টি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এতটাই প্রভাব ফেলেছে যে একুশ শতকে এসেও আমরা এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আমাদের সমাজে তা আজও যেন সমানভাবে বিরাজমান।

উনিশ শতকে ভারত তথা বাংলাদেশে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা, চিরাচরিত প্রথা, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার অনেক বেশি প্রচলিত ছিল। এই পটভূমিকায় সমাজে নারীদের কোনো বিশেষ মর্যাদা ছিল না। তখন সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। অথচ মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আদিম যুগে কোনো পরিবার ছিল না। মানুষের তখন প্রধান লক্ষ্য ছিল খাদ্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করা। আর এক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ উভয়ে মিলে মিশেই খাদ্য সংগ্রহ করতো। ফলে সেখানে নারী এবং পুরুষের মধ্যে কেউ আলাদা করে বিশেষ মূল্য পেত না। পুরুষের সঙ্গে নারীরা খাদ্য সংগ্রহের পাশাপাশি সন্তানও প্রতিপালন করত। ফলে তখন নারীদের কাজ এবং দায়দায়িত্ব অনেকটাই বেশি ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবারের উদ্ভব হল। আর এই পরিবার থেকেই পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব হয়। তখন থেকেই নারীদের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়। নারীরা হয়ে পড়ল পুরুষের অধীনস্থ। বর্তমান সময়ের তুলনায় আদিম সমাজে নারীদের স্থান যে উপরে ছিল এপ্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন, -

> "আদিম মানব সমাজে কোন পরিবার ছিল না। অরণ্যবাসী মানুষ অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করত। পুরুষ শিকার করত আর নারীরা আহরণ করতো ফলমূল। নারীদের অপর কাজ সন্তান ধারণ ও সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন। তাই নারীরা ছিল একদিকে প্রতিপালিকা অন্যদিকে জীবনদাত্রী। তাই আদিম সমাজে নারীর স্থান ছিল উচ্চে।"[২২]

কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজে নারীদের উপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করে তাদের গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা হল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেকক্ষেত্রে নারীদের যেভাবে পদদলিত করা হয়েছিল সে দিকগুলি উনিশ শতকের পটভূমিতে রচিত 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে বাস্তবসম্মতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তৎকালীন সময়ে বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহ, পর্দানসীনতায়, অশিক্ষায় এবং কুসংস্কারে মেয়েরা আবদ্ধ ছিল। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন, -

> "উনিশ শতকের ঘুণধরা সমাজের চরমতম ব্যাধি হল হিন্দুদের কুসংস্কার ও আচার আচরণ ও অন্ধবিশ্বাস। -- যার প্রথম শিকার হল সমাজের নারীরা।"[২৩]

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা প্রয়োজন তখন খ্রিস্টান পরিবারের মেয়েরা দেশীয় মেয়েদের তুলনায় যথেষ্ট শিক্ষিত এবং সূচিশিল্প, সংগীতশিল্পে পারদর্শী ছিল। তাই নাটকের প্রথম দৃশ্যেই আমরা দেখি মধুসূদনকে যখন তাঁর মা দেশীয় বাঙালি মেয়ে বিয়ে করার কথা বলেন তখন তিনি ঘৃণা সহকারে বাঙালি মেয়েদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে শুরু করেন। শুধু তাই নয় ইংরেজের মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে তিনি দেশীয় বাঙালি মেয়েদের রূপ আর গুণ শূন্যতার কথা বলেন। তাঁর মতে, -

> "বাঙালীর মেয়ে রূপে গুণে ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশ হতে পারে না"[২৪]

আবার তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষে মেয়েদের যে খুব কম বয়সে বিয়ে দেওয়া হত, সেই কথাও আলোচ্য নাটকে উঠে এসেছে। একই সঙ্গে ঐ সময়ে ভারতীয় নারীরা পরপুরুষের সামনে অবগুণ্ঠন ছাড়া যে বেরুতে পারতো না সেই দিকটিও এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখি মধুসূদনের বন্ধুরা যখন তাঁর বাড়িতে এলো তখন জাহ্নবী দেবী লম্বা ঘোমটা দিয়ে তাদের সামনে যেতে উদ্যত হলে রাজনারায়ণ দত্ত তাঁকে বলেন, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 118 - 127*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> "তুমি ওদের সামনে আধহাত ঘোমটা দিয়ে বেরোও কেন? ছেলের মত ওরা-"[২৫]

আসলে তখন নারীদের প্রধান স্থান ছিল অন্তঃপুর। এর বাইরে যখনই তাঁরা বের হতেন তখন ঘোমটা দিয়ে বের হতেন। অন্তঃপুরের এই গণ্ডিবদ্ধ জীবনের বাইরে যেন তাঁদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। মোটকথা উনিশ শতকে সমাজে পুরুষদের যে পরিমাণ প্রাধান্য দেওয়া হত সে তুলনায় নারীদের অনেক বেশি অবহেলিত করে রাখা হত।

আসলে কন্যার তুলনায় পুত্র সন্তানকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া বা পুত্র সন্তানের কামনায় অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়া কিংবা একাধিক বিবাহ করার বিষয় প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সমাজব্যবস্থায় চলে আসছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কন্যা সন্তানকে অনেক ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত অতিথি হিসেবে ধরা হয়। তাই তখন কন্যা সন্তানের জন্ম অনেক মা-বাবার কাছেই আকস্মিক দুঃসংবাদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মানুষের মধ্যে এরূপ ধারণার জন্ম দিয়ে গেছে কিছু ধর্মীয় গ্রন্থ। ধর্মই সমাজকে প্রাচীনকাল থেকে কন্যা সম্পর্কে কতগুলি হীন মূল্যবোধ দ্বারা বীতস্পৃহ করে রেখেছে। আর পুত্রকে করেছে মানুষের কাছে পরম কাম্য। পুত্র কামনায় আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ অথর্ব সংহিতায় বলা হয়েছে, -

> "হে নারী, তুমি পুত্র সন্তান উৎপন্ন কর, সে উৎপন্ন পুত্রের পরও পুত্র উৎপন্ন কর। এরূপ অবিচ্ছেদে জাত পুত্রদের তুমি মাতা হও।"[২৬]

মোটকথা পুত্র সন্তান এতই কাঙ্ক্ষিত যেকোনো স্ত্রী যদি শুধু কন্যা সন্তান জন্ম দেয় তাহলে সেই অপরাধে তাকে ত্যাগ করা যায় এবং পুত্রের জন্য পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। আর এর নির্দেশ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে এইভাবে,-

> "স্ত্রী যদি কেবল কন্যাই প্রসব করে, তবে স্বামী দ্বাদশ বৎসর প্রতীক্ষা ক'রে (পুত্র প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা ক'রে) দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে।"[২৭]

আর ধর্ম গ্রন্থে উল্লিখিত এ ধরনের নানা নির্দেশ পরবর্তীকালে আমাদের সমাজের মানুষের মনে খারাপ প্রভাব ফেলেছে। কারণ কন্যা সন্তানের অনাদরের বহুচিত্র আমাদের বর্তমান সমাজেও লক্ষ করা যায়। আর তার প্রতিফলন সাহিত্যেও দেখা যায়। বনফুলের আলোচ্য নাটকেও এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। নাটকে দেখাযায় রাজনারায়ণ দত্ত পুত্র সন্তানের আশায় আরও দুইবার বিবাহ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অল্পবয়সী স্ত্রী হরকামিনী অকূল পাথারে পড়েন। স্বামীর মৃত্যুর পর একাকী, অসহায় হরকামিনীর অবস্থা দেখে মধুসূদন শিউরে উঠেছিলেন। তাছাড়া নাটকে দেখা যায় মধুসূদন ধর্মান্তরিত হলে তাঁর পিতা নিজেদের নিঃসন্তান বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। একমাত্র পুত্র সন্তানের এহেন কাজের দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, -

> "একমাত্র বংশধর—জল-পিণ্ডের একমাত্র আশা। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে।"[২৮]

কারণ তাঁদের ধারণা মৃত্যুর পর পুত্রের হাতে পিণ্ড দান না হলে অমঙ্গল হয়, স্বর্গ প্রাপ্তি হয় না। আর এই আশংকায় জাহ্নবী দেবী স্বামীকে আরেকটি বিয়ে করার জন্যে বলেন। কারণ এতে করে যদি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় তাহলে তাঁদের মৃত্যুর পর পুত্রের হাতে পিণ্ড দান হবে। পুত্র সন্তানের জন্যে এধরণের কাতর প্রার্থনা ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় অহরহ দেখা যায়। আসলে আমাদের সমাজে কন্যা সন্তানের প্রতি যে অনাদরের চিত্র দেখতে পাই তার মূল কারণ হিসাবে ধরা যায় নানা শাস্ত্রীয় বিধানগুলিকে। নানা শাস্ত্রীয় বিধান বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের জীবনকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন, -

> "সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা চিরায়ত করে রাখার জন্যই কন্যা সন্তানকে অবাঞ্ছিত করে রাখা হয়েছে। শাস্ত্রকাররা কন্যাকে দুঃখকষ্টের কারণ বলে প্রতিপন্ন করেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছে— পুত্র হল স্বর্গের প্রদীপ। আর কন্যা হল দুঃখের কারণ। মহাভারতের রাজকাহিনীতেও এ ধরনের মতের উল্লেখ আছে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বেদ-এ পুত্র সন্তানের জন্য প্রার্থনা থাকলেও কন্যা সন্তানের জন্য কোনো প্রার্থনা নেই।"[২৯]

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 118 - 127*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

আবার সমকালীন সময়ে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সমাজ ছিল উদাসীন। মেয়েরা লেখাপড়া করে উপার্জনক্ষম প্রতিষ্ঠিত হবে- তখন এইসব বিষয় যেন কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। যদিও তখন মিশনারিদের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে এদেশে মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি একটু একটু গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিল কিন্তু তাও ছিল সীমাবদ্ধ। দীর্ঘদিন অন্তঃপুরে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখার পর যখন তারা শিক্ষার আলোকস্পর্শে নিজেদের আলোকিত করতে চাইল তখনও সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষ এর বিরোধিতা শুরু করে। নানা ধরনের সমালোচনা কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করা হয় তাদের লক্ষ্য করে। সমাজের এই সমস্ত দিক জ্ঞানেন্দ্র ও কমলমণির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আলোচ্য নাটকে পরিস্ফুট হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্র যখন কমলমণিকে ব্যারিস্টার হওয়ার কথা বলেন তখন কমলমণি আক্ষেপের সঙ্গে বলে, -

> "এদেশে মেয়েরা করবে ব্যারিস্টারি? তাহলেই হয়েছে। এমনিই ত তোমাদের গুপ্ত কবির ছড়ার জ্বালায় অস্থির। মেয়েরা ইস্কুলে সামান্য লেখা-পড়া শিখবে তাই নিয়েই তোমাদের কত আন্দোলন, খবরের কাগজে লেখালেখি, মাঠে-ঘাটে বক্তৃতা—সামান্য ইস্কুলে পড়া নিয়েই এত কাণ্ড—ব্যারিস্টারি করলেই হয়েছে! (একটু পরে) ভাগ্যে মিশনারিরা কতকগুলো মেয়েদের ইস্কুল করেছে তাই এদেশে মেয়েদের বর্ণপরিচয় হচ্ছে।"[৩০]

তখন মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টিকে কটাক্ষ করে কিছু সংখ্যক গুপ্ত কবি ছড়া বানিয়ে ব্যঙ্গ করতেন। এ ধরনেরই একটি ছড়া জ্ঞানেন্দ্রের মুখে আলোচ্য নাটকে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে, -

"যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে
এ, বি, শিখে বিবি সেজে
বিলাতি বোল কবেই কবে।
আর কিছু দিন থাক রে ভাই
পাবেই পাবে দেখতে পাবে
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"[৩১]

আসলে সভ্যতার যতই অগ্রগতি হোক না কেন আমাদের সমাজে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে তফাতের বিষয়টি এখনও গুরুতর। এখনও আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছেলেদের বেলায় যে স্বাধিকার দিয়ে থাকি মেয়েদের ক্ষেত্রে তা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দিতে পারি না। আর এই না দেওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড়ো বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের সমাজব্যবস্থা। সমাজে প্রচলিত কিছু অযৌক্তিক বিধিনিষেধই এর জন্য প্রধানভাবে দায়ী। আর উনিশ শতকের সমাজব্যবস্থার এইসব নানা রূঢ়চিত্র আলোচ্য নাটকে বাস্তবসম্মতভাবে উঠে এসেছে। তবে সমাজবাস্তবতার নিরিখে এই নাটকের কিছু ত্রুটিও লক্ষ করা যায়। কারণ নাটকের প্রেক্ষাপটের বিচারে উপরিক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও সমসাময়িক বিষয় ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সীমাহীন শোষণ ও পরাধীন ভারতের দুর্দশা। এই বিষয়টি নাটকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলোচ্য নাটকে মধুসূদনের ব্যক্তি জীবন বর্ণনার অনুষঙ্গে উনিশ শতকের সমাজ প্রতিবেশের বাস্তবচিত্র যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে নাটকটি সমকালীন সময়ের একটি দলিল হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে।

## Reference:

১. চক্রবর্তী, শুভাশিস, 'বনফুল ১২৫', সুমন সেনগুপ্ত (সম্পা.), 'বইয়ের দেশ', এবিপি প্রা. লিমিটেডের পক্ষে জাহরা বসরারাই কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০১, জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা ২০২৪, পৃ. ৮৬
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', পুনর্মুদ্রণ ২০০৫, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ৩৬৮

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 17*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 118 - 127*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

৩. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (আধুনিক যুগ), দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১৫৪
৪. ঘোষ, মহুয়া, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা নকশার আরশিতে', প্রথম প্রকাশ ২০১৮, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৯
৫. বনফুল, 'শ্রীমধুসূদন', দশম বাণীশিল্প সংস্করণ, জুন ২০২২, বাণীশিল্প প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১২
৬. গিরি, ড. সত্যবতী, ও ড. সমরেশ মজুমদার(সম্পা.), 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন' (প্রথম খণ্ড), তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১৩, রত্নাবলী প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৫৬০
৭. শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৬৭
৮. বনফুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
৯. তদেব, পৃ. ২৩
১০. তদেব, পৃ. ২৬
১১. তদেব, পৃ. ২৫
১২. তদেব, পৃ. ২৭
১৩. তদেব, পৃ. ৩৬
১৪. তদেব, পৃ. ২৮
১৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
১৬. তদেব, পৃ. ৩৬
১৭. বনফুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
১৮. তদেব, পৃ. ৪১
১৯. তদেব, পৃ. ৪২
২০. তদেব, পৃ. ১৭
২১. তদেব, পৃ. ৩৮
২২. দে, বিদ্যুৎবিকাশ, 'উনিশ শতকের নারী সমাজ ও বিদ্যাসাগর', ফেব্রুয়ারি ২০০৭, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২০
২৩. মণ্ডল, তপন, 'মধুসূদনের প্রহসন কালের দর্পণ', পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১৫
২৪. বনফুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
২৫. তদেব, পৃ. ১৩
২৬. গোস্বামী, বিজন বিহারী (অনুদিত ও সম্পা.), 'অথর্ববেদ সংহিতা', ৩/৫/২, ১৯৭৮ সাল, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৯৮
২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (অনুদিত ও সম্পা.), 'কৌটিলীয়াম্ অর্থশাস্ত্রম' (প্রথম খণ্ড), ৩/২/৭, ২০০২ সাল, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৫০৫
২৮. বনফুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬
২৯. বিদ্যুৎবিকাশ দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
৩০. বনফুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯
৩১. তদেব, পৃ. ৩৯